নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক থাকলেও, বিংশ শতাব্দীতে এই বিষয়টির বিবর্তন হয়েছে মূলত তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধারায়। এই ধারাগুলি হল যথাক্রমে আদর্শবাদ, বাস্তববাদ এবং ব্যবহারবাদ (Behaviouralism)। এখানে উল্লেখ্য এই ধারাগুলি ক্রমান্বয়ে দেখা দেয়নি— বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, এই ধারাগুলি যেমন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনাকে নিজ নিজ ছত্রছায়ায় নিয়ে এসেছে, তেমনি বিভিন্ন সময়ে কোন একটি ধারা অন্য একটি ধারার সঙ্গে বিতর্কের (debate) পর্যায়ে পৌঁছেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আদর্শবাদের ধারাটি বিকশিত হয় ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকে মূলত উড্রো উইলসনের চিন্তা ভাবনাকে কেন্দ্র করে। আদর্শবাদী চিন্তাভাবনার মূল ভিত্তি ছিল এই রকম— প্রথমতঃ, মানবচরিত্র যতখানি না আত্মকেন্দ্রিক, তার চেয়ে অনেকবেশী স্বার্থহীন— এবং স্বাভাবিকভাবেই মানবগোষ্ঠীর সদস্যরা একে অপরের দিকে সহজেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আবার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার এই প্রবণতাই মানবসভ্যতার উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। তৃতীয়তঃ, মানুষ যদি খারাপ কাজ করে, তার জন্য মানুষ যতখানি না দায়ী, তার চেয়ে অনেক বেশী দায়ী কিছু খারাপ প্রতিষ্ঠান বা সামাজিক কাঠামো যা মানুষকে স্বার্থান্বেষী কাজ করতে বাধ্য করে। যুদ্ধ বা সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের জন্য দায়ী এই আন্তর্জাতিক কাঠামো। চতুর্থতঃ, আদর্শবাদীরা মনে করেন যুদ্ধ কখনই মানবসমাজের অপরিহার্য অঙ্গ হতে পারে না— যুদ্ধের অবসানের বীজ নিহিত আছে আন্তর্জাতিক নৈরাজ্যের দূরীকরণের মধ্যে। পঞ্চমতঃ, যুদ্ধ বা আন্তর্জাতিক নৈরাজ্য দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন আন্তর্জাতিক স্তরে যৌথ প্রচেষ্টা— শুধুমাত্র জাতীয় প্রয়াসে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ষষ্ঠতঃ, আদর্শবাদীরা আন্তর্জাতিক স্তরে নৈরাজ্য দূরীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সামাজিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠনের পক্ষে মত দেন। সবশেষে, তারা মনে করেন, এই ধরনের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবসম্মত। কারণ বিশ্ববিবর্তনের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, মানব সমাজের পারস্পরিক সহযোগিতাই বিশ্বব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে লুকিয়ে আছে এক নূতন বিশ্বের স্বপ্ন— এই পৃথিবী হয়তো এখনও তৈরী হয়নি, কিন্তু এই ভবিষ্যৎদ্রষ্টারা চান আন্তর্জাতিক শান্তিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করতে এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে নৈতিকতা ও দায়িত্বসচেতনতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে তুলতে। একথা ঠিক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও ঠাণ্ডাযুদ্ধের সময়ে আন্তর্জাতিক অনিশ্চয়তা আদর্শবাদী চিন্তার মূল বক্তব্যকে অনেকখানি অসত্য বলে প্রমাণ করলেও, ঠাণ্ডাযুদ্ধের অবসানে নয়া উদারনীতির (Neoliberalism) উদ্ভবের মধ্যে অনেকটাই লুকিয়ে আছে উইলসনীয় মতাদর্শের প্রভাব।

১.৩ বাস্তববাদ ঃ

ঠাণ্ডাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বাস্তববাদ (Realism) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে— এবং ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে এবং তৎপরবর্তী সময়েও এই তত্ত্বটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজস্ব গুরুত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। এই তত্ত্বটির উৎপত্তির অনুসন্ধান করতে গেলে শুরু করতে হয় থুসিডাইডিসের (Thucydides) বিখ্যাত গ্রন্থ The Peloponnesian War থেকে— এর রাজনৈতিক যাথার্থের সন্ধান পাওয়া যায় মেকিয়াভেলি বা হবসের লেখার মধ্যে। তবে বিংশ শতকে যে সমস্ত লেখকেরা এই তত্ত্বটির বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন তাদের মধ্যে আছেন ঃ ই. এইচ্ কার্ (E.H. Carr), হান্‌স জে. মর্গানথাউ (Hans J. Morgenthau), জর্জ কেনান (George Kennan) এবং আরও অনেকে। বাস্তববাদী তত্ত্বটির মূল ভিত্তিটি ছড়িয়ে আছে নিম্নোক্ত অনুমানের ওপরে ঃ প্রথমতঃ সমস্ত মানুষই স্বার্থান্ধ এবং ক্ষমতার কাঙালীপনা ও অপরের ওপর প্রভুত্ব করার আকাঙ্ক্ষা মানবচরিত্রের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু ক্ষমতার ও প্রভুত্ব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা মানবচরিত্র থেকে দূরীকরণ একান্তই অসম্ভব, আন্তর্জাতিক সম্পর্কও এই সূত্র মেনে পরিণত হয়েছে ক্ষমতার এক চিরন্তন সংঘাতের ক্ষেত্রে। তৃতীয়তঃ, সমস্ত রাষ্ট্রের প্রাথমিক বা মূল দায়িত্ব ও কর্তব্য হল নিজস্ব ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার করায়ত্ত করাই হল 'জাতীয় স্বার্থ' (National Interest) বাড়ানো ও রক্ষা করার একমাত্র চাবিকাঠি। চতুর্থতঃ, আন্তর্জাতিক দুনিয়ার মূল বৈশিষ্ট্য যেহেতু নৈরাজ্য, সেহেতু জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যেকোন রাষ্ট্রেরই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত সামরিক শক্তিকে ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে যাওয়া — বাস্তববাদীদের কাছে সামরিক ক্ষমতাবৃদ্ধি অর্থনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির চেয়ে তুলনামূলক ভাবে বেশী গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সামরিক ক্ষমতাবৃদ্ধিই একটি রাষ্ট্রের মর্যাদাবৃদ্ধি ও জাতীয় স্বার্থ পরিপূরণের মুখ্য মানদণ্ড। পঞ্চমতঃ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব বজায় রাখার মূল মাধ্যম হল ক্ষমতার সমতা (Balance of Power) তৈরী করা। বাস্তববাদীরা মনে করেন, ক্ষমতার সাম্যের মাধ্যমে তুলনামূলক ভাবে দুর্বল রাষ্ট্র বৃহত্তর শক্তির বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করতে পারে, কিন্তু মিত্রশক্তির আনুগত্য ও নির্ভরযোগ্যতা চিরন্তন বলে মেনে না নেওয়াই হবে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। সবশেষে, বাস্তববাদীরা আন্তর্জাতিক সংগঠন বা আন্তর্জাতিক আইনকে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের অন্যতম মাধ্যম বলে মানতে নারাজ।

একথা ঠিক যে, বাস্তববাদীদের একটি সমপ্রকৃতি গোষ্ঠী বলে মনে করলে ভুল করা হবে। কিন্তু, বাস্তববাদীদের সকলেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে এবং বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্ব দেন। প্রথমতঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের